POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ
كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসা অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।

(আলে ইমরান, আয়াত: ৬০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 15

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11 এপ্রিল, 2019 5 শাবান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

মুত্তাকির মর্যদা সম্পর্কে বলা হয়েছে- ওয়া ইউকিমুনাস সলাত' অর্থাৎ সে নামায কে দাঁড় করায়। আল্লাহু আকবর' উচ্চারণে নামায আরম্ভ করা মাত্রই শত-সহস্র কুমন্ত্রণার ঢেউ তার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে আছড়ে পড়ে। সেগুলি তাকে বহুদূরে নিয়ে যায় যা তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কিন্তু সে নামাযে মনোযোগ ও শান্তি বহালের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। পতনোন্মুখ নামাযকে উত্থিত করতে সে সব সময় ব্যগ্র থাকে। আর এই দোয়া উচ্চারণ করতে থাকে- 'ইইয়া কানাবুদু ওইয়াকা নাসতাঈন'

একজন মুত্তাকি ব্যক্তিকে নামাযে নিজের সঙ্গে এই সংগ্রাম অবশ্যই করতে হয় আর পরিণামে এটিই তাকে আধ্যাত্মিক প্রতিদান দিয়ে থাকে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

অদৃশ্যের উপর ঈমান

যেরূপে উপরে আমি বর্ণনা করেছি যে, তাকওয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সাধনা ও সংগ্রামের দাবি করে। এই কারণেই বলা হয়েছে- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (আল বাকারা: ৩, ৪) এতে এক অসাধারণ সংগ্রাম রয়েছে। কোন কিছু প্রত্যক্ষ করার তুলনায় কোন অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই কারণেই মুত্তাকিদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি ও সংগ্রামের প্রয়োজন। যখন কোন ব্যক্তি সালেহ বা পুণ্যবানের মর্যাদায় উপনীত হয়, তখন তার কাছে অদৃষ্ট আর লুক্কায়িত থাকে না। কেননা তার মধ্য থেকে এক স্রোত উৎসারিত হয়ে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমন ব্যক্তি খোদা এবং তাঁর ভালবাসাকে স্বচক্ষে দর্শন করে। وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى (বনী ইসরাঈল: ৭৩)। এর থেকেই স্পষ্ট হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইহজগতেই পূর্ণ জ্যোতি অর্জন না করে, সে কখনওই খোদার চেহারা দেখতে সক্ষম হবে না। অতএব মুত্তাকির কাজ হল সব সময় এমন সুরমা প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত থাকা যা আধ্যাত্মিক চোখের ছানি দূর করে। এখন এর থেকে প্রমাণ হয় যে, মুত্তাকি প্রারম্ভে অন্ধ থাকে। বিভিন্ন চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে সে জ্যোতি লাভ করে। এমন ব্যক্তি যখন জ্যোতি লাভ করে এবং সালেহ বা পুণ্যবান হয়, তখন তাদেরকে আর অদৃষ্টের উপর ঈমান আনতে হয় না বা এর জন্য অতিরিক্ত সাধনাও করতে হয় না। যেভাবে, হযরত রসুলে করীম (সা.)কে তাঁর চোখ দিয়ে এই পৃথিবীতেই বেহেশত ও দোযখ এবং আরও অন্যান্য অদৃশ্যের বিষয়াদি ইতাদি দেখানো হয়েছে, যেগুলোর উপর একজন মুত্তাকিকে ঈমান আনতে হয়, সেগুলি আঁ হযরত (সা.)কে ইহজগতেই দেখানো হয়েছে। এই আয়াতে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও একজন মুত্তাকি অন্ধ, সে পরিশ্রম করে, কিন্তু যে সালেহ বা পুণ্যবান, তার বাসস্থান নিরাপদ হয়ে ওঠে। এবং সে এক শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা হয়ে ওঠে। অপরদিকে মুত্তাকি এমন এক অবস্থায় বিরাজ করে যেখানে অবশ্যই তাকে অদৃষ্টের উপর ঈমান আনতে হয় আর সে এক অন্ধ রীতি-নীতির অনুসরণ করে যা সম্পর্কে সে সবিশেষ অবগত থাকে না। সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে চলে। এটিই মুত্তাকিদের সততা আর তার এই সততার কারণেই খোদা তা'লা তাকে সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (বাকারা: ৬)

নামায প্রতিষ্ঠা

এরপর মুত্তাকির সম্মানে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন- وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ (বাকারা: ৪) অর্থাৎ সে নামায কে দাঁড় করায়। এখানে দাঁড় করানো শব্দের মধ্যেও কঠোর সাধনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সে নামায আরম্ভ করার পর বিভিন্ন প্রকারের কুমন্ত্রণাকে প্রতিহত করে যেগুলির কারণে বার বার নামাযের পতন হয় যা অবশ্যই তাকে দাঁড় করাতে হবে। আল্লাহু আকবর' উচ্চারণে নামায আরম্ভ করা মাত্রই শত-সহস্র কুমন্ত্রণার ঢেউ তার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে আছড়ে পড়ে। সেগুলি তাকে বহুদূরে নিয়ে যায় যা তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কিন্তু সে নামাযে মনোযোগ ও শান্তি বহালের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। পতনোন্মুখ নামাযকে উত্থিত করতে সে সব সময় ব্যগ্র থাকে। আর এই দোয়া উচ্চারণ করতে থাকে-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ । এই দোয়ায় সে হেদায়াতের সরল পথ প্রার্থনা করে যেন তার নামায প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল কুমন্ত্রণার সম্মুখে মুত্তাকি ব্যক্তি একজন শিশুর ন্যায় হয়ে যায় যে খোদার সামনে আকুল প্রার্থনা করে। সে খোদার সামনে অশ্রু বিসর্জন দেয় এবং অনুনয় বিনয় করে এবং এই স্বীকারুক্তি দেয়- اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭৭) । একজন মুত্তাকি ব্যক্তিকে নামাযে নিজের সঙ্গে এই সংগ্রাম অবশ্যই করতে হয় আর পরিণামে এটিই তাকে আধ্যাত্মিক প্রতিদান দিয়ে থাকে।

অনেকে আবার নামাযের মধ্যে তৈরী হওয়া কুমন্ত্রণাকে অবিলম্বে দূর করতে চায়, যদিও **'ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা'** অন্যদিকে ইঙ্গিত করছে। খোদা কি অবগত নন? হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-বলেছেন , ততক্ষণ পুণ্যলাভ হয় যতক্ষণ সংগ্রাম ও সাধনা থাকে। এই সংগ্রাম ও সাধনা অনুপস্থিত থাকলে পুণ্যও আর থাকে না। ভিন্নবাক্যে নামায ও রোযা ততক্ষণ পর্যন্তই পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ এগুলি সম্পাদনে কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার প্রয়োজন দেখা দিবে। কিন্তু যখন সে এক উচ্চ মর্যাদা লাভ করে এবং রোযা-নামায সম্পাদনকারী তাকওয়ার সাধনা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের মধ্যে সহজাত পুণ্যের গুণ বিকশিত করে, তখন নামায ও রোযা আর কর্ম থাকে না। সেই সময় শেখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) নিজেকে প্রশ্ন করলেন, এমন অবস্থায় পৌঁছে কি নামায থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? কেননা, পুণ্যকর্মের প্রতিদান ততক্ষণ লাভ হয় যতক্ষণ তার মধ্যে চেষ্টা ও সাধনা থাকে। বস্তুত এই পর্যায়ে নামায আর কর্ম থাকে না, বরং সেটিই হয়ে ওঠে একটি পুরস্কার। এই নামাযই তখন এমন ব্যক্তির খোরাক ও নয়নের স্নিগ্ধতা হয়ে ওঠে। ভিন্নবাক্যে এটিই ইহজগতের জান্নাত।

এর বিপরীতে, যারা সংগ্রাম করছে তারা একপ্রকারের মল্লযুদ্ধ করছে। অন্যদিকে এরা ইতিপূর্বেই মুক্তিলাভ করেছে। এর অর্থ মানুষের আধ্যাত্মিক যাত্রা যখন শেষ হয়, তার বিপদাপদ ও পরীক্ষারও অবসান ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ- একজন নপুংসক যদি দাবি করে যে, সে মহিলাদের প্রতি কখনও কুদৃষ্টি দেয় না, তবে এর জন্য সে কি কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? তার মধ্যে কুদৃষ্টি দেওয়ার গুণই তো নেই। কিন্তু একজন সামর্থবান পুরুষ যদি এমনটি করে তবে প্রতিদান পাবে। অনুরূপে মানুষকে হাজার হাজার ধাপ অতিক্রম করে যেতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রমাগত অনুশীলন তার মধ্যে এক শক্তির সঞ্চার করে। স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে সে এক প্রকার জান্নাতে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় পুণ্য আর থাকবে না।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

যে আল্লাহ্ তা'লার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করেন, আর যে আত্মাম্ভরিতা প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করেন।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তমান প্রতীক মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবাগণ।

হযরত খওলী বিন আবি খওলী, হযরত রাফি বিন মুয়াল্লি, হযরত যুশ শিমালায়েন উমায়ের বিন আবদে আমর, হযরত রাফি বিন ইয়াযিদ, হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস, হযরত খাওয়াত বিন জুবায়ের আনসারী, হযরত রাবিয়া বিন আকসাম, হযরত রিফা বিন আমর আনসারী, হযরত যায়েদ বিন ওয়াদিয়া, হযরত রিবি বিন রাফি আনসারী, হযরত যায়েদ বিন মুযায়েন, হযরত ইয়াস বিন যুহায়ের, হযরত রিফাআ বিন আনসারী, হযরত যিয়াদ বিন আমর, হযরত সালেম বিন উমায়ের বিন সাবেত, হযরত সুরাকা বিন কাব, হযরত সায়েব বিন মাযউন, হযরত আসিম বিন কায়েস, হযরত তুফায়েল বিন মালেক বিন খানসা, হযরত তুফায়েল বিন নুমান, হযরত যাহাক বিন আবদে আমর, হযরত যাহাক বিন হারেসা, হযরত খাল্লাদ বিন সুয়ায়েদ এবং হযরত অউস বিন খওলি রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু-র পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১ মার্চ , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১ আমান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: বদরী সাহাবীদের ঘটনাবলী অথবা তাদের জীবন চরিত বর্ণনার ধারা চলছে। আজও এরই ধারাবাহিকতায় কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো। প্রথমজন হলেন, হযরত খওলী বিন আবী খওলী। হযরত খওলী বদর ও ওহুদের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। আবু মা'শার এবং মুহাম্মদ বিন ওমর বলেন, হযরত খওলী তার পুত্রকে সাথে নিয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্তু তিনি পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, এরা সবাই ইতিহাসবিদ, হযরত খওলী তার সহোদর মালেক বিন আবী খওলীর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। একটি ভাষ্য মতে, বদরের যুদ্ধে হযরত খওলী এবং তার অপর দু'ভাই হযরত হেলাল বিন আবী খওলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী খওলীও অংশ নিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত খওলী ইন্তেকাল করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত রা'ফে বিন আল্ মুয়াল্লা। হযরত রা'ফে বিন আল্ মুয়াল্লা খাযরাজ গোত্রের বনু হাবীব শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল, ইদাম বিনতে অওফ। মহানবী (সা.) হযরত রা'ফে এবং হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি। মূসা বিন উকবার বর্ণনা হলো, হযরত রা'ফে এবং তার ভাই হেলাল মুয়াল্লা উভয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত রা'ফে-কে ইকরামা বিন আবু জাহল বদরের যুদ্ধে শহীদ করেছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫, প্রকাশনায়-দার আল জিল, বেরুত)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যুশ্ শেমালায়ন হুমায়ের বিন আবদে আমর। যুশ্ শেমালায়ন হুমায়ের বিন আবদে আমর। তার আসল নাম ছিল উমায়ের আর ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। যেমনটি বলা হয়েছে, হযরত উমায়েরের ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, তাকে যুশ্ শেমালায়ন বলে ডাকা হতো, এটি তার নাম ছিল না, বরং তিনি এটি একটি উপাধি লাভ করেছিলেন, কেননা তিনি বাম হাত দিয়ে বেশিরভাগ কাজ করতেন। অপর এক রেওয়ায়েতে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি তার উভয় হাত দিয়ে কাজ করতেন আর একইভাবে দু'হাত ব্যবহার করতেন, তাই তাকে যুল্ ইয়াদায়নও বলা হতো। তিনি বনু খুযাআ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বনু যাহরা-র মিত্র ছিলেন। হযরত উমায়ের মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং হযরত সা'দ বিন খায়সামা-র কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) ইয়াযিদ বিন হারেস এর সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। এই উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং উসামা জশমী তাকে শহীদ করেছিল। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩০বছর। আত্তাবাকাতুল কুবরাতে আবু উসামা জশমী নাম উল্লেখ রয়েছে যে, সে হত্যা করেছিল। উসামা জশমীর নাম সেখানে আবু উসামা জশমী লেখা হয়েছে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৪-১২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩২৭, প্রকাশনায় দার ইবনে হাযাম, বেরুত) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত রা'ফে বিন ইয়াযিদ। একটি রেওয়ায়েতে তার নাম রা'ফে বিন যায়েদও বর্ণিত হয়েছে। হযরত রা'ফে বিন ইয়াযিদ আনসারদের অওস গোত্রের বনু যহুর বিন আব্দুল আশহাল শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত রা'ফের মাতা আকরাব বিনতে মুআয প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সা'দ বিন মুআয এর বোন ছিলেন। হযরত রা'ফের দু'জন পুত্র ছিল- উসায়েদ এবং আব্দুর রহমান। তাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল আকরাব বিনতে সালামা। হযরত রা'ফে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এক বর্ণনা অনুসারে তিনি বদরের যুদ্ধের দিন সাঈদ বিন যায়েদ এর উটের ওপর আরোহিত ছিলেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো, হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস। তার ডাক নাম ছিল আবু সাবোহ্। হযরত যাকওয়ান আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু যুরাইক শাখার সদস্য ছিলেন। তার পারিবারিক নাম ছিল, আবু সাবোহ্। তিনি উকবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন। তার একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা হলো, তিনি মদিনা থেকে হিজরত করে মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কায় যান। সে সময় পর্যন্ত মহানবী (সা.) মক্কাতেই ছিলেন। তাকে আনসারী মুহাজের বলা হতো।

মক্কায় গিয়ে তিনি কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন, অথবা বলা যেতে পারে যে, তিনি হিজরত করে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে যান। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। তাকে আবু হাকাম বিন আখনাস শহীদ করেছিল। হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েসকে আনসারী মুহাজির বলা হয়।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

আল্লামা ইবনে সা'দ আত্তাবাকাতুল কুবরা-তে লিখেন যে, মদীনায় হিজরতের সময় যখন মুসলমানরা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে তখন কুরাইশরা প্রচণ্ড রাগান্বিত ছিল আর যেসব যুবক হিজরত করে চলে গিয়েছিল তাদের ওপর প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়। আনসারদের একটি দল উকবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিল এবং এরপর মদীনায় ফিরে গিয়েছিল। প্রাথমিক মুহাজেররা যখন 'কুবা' পৌঁছে তখন এই আনসাররা মক্কা'য় মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং তাঁর (সা.)সাহাবীদের সাথে হিজরত করে মদীনায় আসে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদেরকে আনসার মুহাজেরীন বলা হয়। এই সাহাবীদের মধ্যে হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস, হযরত উকবা বিন ওয়াহাব, হযরত আব্বাস বিন উবাদা এবং হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর সব মুসলমান মদিনায় চলে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর এবং হযরত আলী ছাড়া, অথবা যারা সমস্যা কবলিত ছিল, অর্থাৎ বন্দি ছিল, অসুস্থ ছিল কিংবা যারা বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল ছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

সুহায়েল বিন আবী সালেহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন ওহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ঐদিকে কে যাবে? যুরায়েক গোত্রের একজন সাহাবী হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস আবু সাবোহ দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যাবো। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? হযরত যাকওয়ান বলেন, আমি যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস। মহানবী (সা.) তাকে আসন গ্রহণ করার জন্য ইশারা করেন। তিনি (সা.) একথার তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন এরপর তিনি বলেন, অমুক অমুক স্থানে চলে যাও, তখন হযরত যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিশ্চয় আমি-ই সেসব স্থানে যাবো। মহানবী (সা.) বলেন, কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়- যে আগামীকাল জান্নাতের শ্যামল ভূমিতে বিচরণ করবে তাহলে এই ব্যক্তিকে দেখে নাও। এরপর হযরত যাকওয়ান তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে যান। তার সহধর্মীনি এবং কন্যারা তাকে বলতে থাকে যে, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে নিজের কাপড়ের প্রান্ত ছাড়িয়ে নেন এবং কিছুটা দূরে সরে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এখন কিয়ামত দিবসেই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। এরপর ওহুদের যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন।

(মুতারাফিস সাহাবা লি আবি নাঈম, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস সম্পর্কে কেউ কিছু জানে কি-না? (তখন) হযরত আলী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি একজন অশ্বারোহীকে দেখেছি যে যাকওয়ানের পশ্চাদ্ধাবন করছিল, এমনকি সে তার নিকটে পৌঁছে যায় আর সে একথা বলছিল যে, আজ তুমি যদি প্রাণে বেঁচে যাও তাহলে আমি বাঁচতে পারবো না, সে পদাতিক অবস্থায় থাকা হযরত যাকওয়ানের ওপর আক্রমণ করে তাকে শহীদ করে দেয়। তিনি (অর্থাৎ হযরত আলী) নিবেদন করেন, সে (অর্থাৎ আততায়ী) একথা বলে তার ওপর আক্রমণ করছিল যে, আমি ইবনে এলাজ। হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, আমি সেই আততায়ীর ওপর আক্রমণ করি এবং তার পায়ে আমার তরবারি দ্বারা আঘাত করে উরুর অর্ধেক অংশ কেটে ফেলি, এরপর তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে এনে হত্যা করি। হযরত আলী বলেন, আমি দেখেছিলাম যে, সেই (আততায়ী) ছিল আবুল হাকাম বিন আখনাস।

(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত খাওয়াদ বিন জুবায়ের আনসারী (রা.)। তার ডাক নাম আব্দুল্লাহ্ এবং আবু সালেহ্‌ও ছিল। হযরত খাওয়াদ সা'লেবাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত খাওয়াদ বিন জুবায়ের হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এর সহোদর ছিলেন, যাকে মহানবী (সা.) ওহুদের যুদ্ধের সময় গিরিপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে পঞ্চাশজন তিরন্দাজের সাথে নিয়োজিত করেছিলেন। অর্থাৎ তার (হযরত খাওয়াদের) ভাইকে। হযরত খাওয়াদ মাঝারি গড়নের ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরীতে ৭৪ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনা অনুসারে মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯৪ বছর। তিনি মেহেন্দী এবং ভিসমা (অর্থাৎ নীল পাতার তৈরি) কলপ ব্যবহার করতেন। হযরত খাওয়াদও মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে একটি পাথরের তীক্ষ্ণ প্রান্তের আঘাতে তিনি আহত হন। তাই মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বদরের গণিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেন তিনি সেসব লোকের মতোই ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ওহুদ, খন্দকসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

হযরত খাওয়াত বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করি। তিনি বলেন, আমি আমার তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখি কয়েকজন মহিলা সেখানে বসে কথা বলছিল, এটি দেখে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমি ফিরে যাই এবং একটি জুব্বা বা আলখাল্লা পরিধান করে তাদের সাথে বসে পড়ি। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে মহিলাদের আলাপচারিতা শোনার জন্য সেখানে বসে পড়েন। ইত্যবসরে মহানবী (সা.) নিজের তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আমি মহানবী (সা.)-কে দেখে ভয় পাই এবং তাঁকে বলি, আমার উট পালিয়ে গেছে, আমি সেটি খুঁজছি। (অর্থাৎ সে দাঁড়িয়ে হুযূর (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করে।) মহানবী (সা.) হাঁটতে আরম্ভ করেন, তিনি কিছুটা এগিয়ে গেলে আমিও তাঁর পিছু অনুসরণ করি, তিনি তাঁর গায়ের চাদর আমাকে ধরিয়ে দেন আর ঝোপের মধ্যে চলে যান। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর তিনি ওযু করেন এবং ফিরে আসেন। তখন তাঁর দাঁড়ি থেকে পানির ফোটা তাঁর বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল। এরপর তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) রসিকতাচ্ছলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আব্দুল্লাহ্! তোমার সেই উট কী করেছিল? উটতো আসলে হারায় নি, মহানবী (সা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে এমনিতেই সেখানে বসেছিল, অর্থাৎ মহিলাদের আলাপচারিতা শোনার জন্য সেখানে বসেছিল এবং এটি কোন ভালো অভ্যাস নয়। যাহোক তিনি বলেন, এরপর আমরা আবার চলতে আরম্ভ করি। এরপর যখনই মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তিনি সালাম করতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন যে, হে আব্দুল্লাহ্! তোমার সেই উট কী করেছিল? যখন এমন হতে থাকে আর বার বার মহানবী (সা.) আমাকে এই সূত্র ধরে রসিকতা করে কৌতুক করতেন। তখন আমি মদীনায় লুকিয়ে থাকতে আরম্ভ করি এবং মসজিদ ও মহানবী (সা.)-এর বৈঠকাদি থেকে দূরে থাকতে আরম্ভ করি। এ ঘটনার কিছুদিন পার হয়ে গেলে একদিন আমি মসজিদে যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হই, মহানবী (সা.)-ও তাঁর হুজরা থেকে বাইরে আসেন এবং তিনি দু'রাকাত নামায পড়েন। আমি নামায দীর্ঘ করতে থাকি এই আশায় যে, তিনি (সা.) চলে যাবেন এবং আমি ছাড়া পাবো। মহানবী (সা.) বলেন, আবু আব্দুল্লাহ্! যতক্ষণ ইচ্ছা নামায দীর্ঘ কর, আমি এখানেই আছি। আমি মনে মনে বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার সম্পর্কে তাঁর হৃদয়কে পরিষ্কার করে দেবো। আমার সালাম ফেরানোর পর মহানবী (সা.) বলেন, "আবু আব্দুল্লাহ্! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সেই উটটি পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আসলে কী? আমি নিবেদন করি, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেই উট পালায় নি। তিনি (সা.) তিনবার বলেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়ার্দ্র হোন, এরপর এ সম্পর্কে তিনি (সা.) আর কখনো আমাকে কিছু বলেন নি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬২-৩৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া

রসুলের বাণী

সেই চক্ষুদ্বয়ের জন্য আগুন হারাম হয়ে যায় যা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় জাগ্রত হয় এবং সেই আগুণ ঐ চক্ষুদ্বয়ের জন্যও হারাম হয়ে যায় যা আল্লাহ্‌র ভীতির কারণে অশ্রু বিসর্জন করে।

(সুনান দারামী, কিতাবুল জিহাদ)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

মোটকথা এ ঘটনা থেকে এটি বুঝা যায় যে, আমার কাছে লুকিও না, আসল ঘটনা কি তা আমি জানি। দ্বিতীয়ত এভাবে অকারণে অন্যদের বৈঠকে বসে তাদের কথা শোনা অন্যায়।

হযরত খাওয়াদ বর্ণনা করেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি যখন আরোগ্য লাভ করি তখন তিনি (সা.) বলেন, হে খাওয়াদ! তুমি আরোগ্য লাভ করেছ; অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর। আমি নিবেদন করি, আমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন ওয়াদা করি নি! তিনি (সা.) বলেন, এমন কোন রোগী নেই যে অসুস্থ হয় আর কোন মানত বা সংকল্প করে না। সে অবশ্যই বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করলে আমি এটা করবো বা সেটা করবো। তাই আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তুমি যা-ই বলেছ তা পূর্ণ কর।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

অতএব, এটি এমন বিষয়, যা আমাদের সবার অভিনিবেশ ও মনোযোগের দাবি রাখে।

খন্দকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে বনু কুরায়যার অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কর্তৃক লিখিত ঘটনার বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জ্ঞাত হন তখন তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য বা অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য যুবায়ের বিন আওয়ামকে ২/৩ বার গোপনে গোপনে প্রেরণ করেন। এরপর রীতি অনুসারে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয, সা'দ বিন উবাদা এবং অন্য প্রভাবশালী সাহাবীদেরকে একটি প্রতিনিধি দল আকারে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এই জোরালো নির্দেশ দেন যে, যদি কোন আশঙ্কাজনক সংবাদ থাকে তাহলে ফিরে এসে প্রকাশ্যে তা বলে বেড়াবে না বরং ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ কোরো যাতে মানুষের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার না ঘটে বা ভীতি ছড়িয়ে না পড়ে। যখন তারা বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছেন, অর্থাৎ যেখানে তারা বসবাস করতো বা তাদের বাড়ি-ঘর ছিল, তখন তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদের কাছে যান। তখন সেই দুর্ভাগা তাদের সাথে চরম দাম্ভিকতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং উভয় সা'দ, অর্থাৎ সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন উবাদার পক্ষ থেকে সন্ধি বা চুক্তির কথা স্মরণ করানো হলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলে, যাও! মোহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি বা সন্ধি হয় নি। এই বাক্য শোনার পর সাহাবীদের এই প্রতিনিধি দলটি সেখান থেকে উঠে চলে আসে এবং সা'দ বিন মু'আয ও সা'দ বিন উবাদা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যথোচিত উপায়ে হুযূর (সা.)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীনঈন, পৃ: ৫৮৪-৫৮৫)

সাহাবীদের এই দলে হযরত খাওয়াদ বিন যুবায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত খাওয়াদকে তাঁর নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে বনু কুরায়যা অভিমুখে প্রেরণ করেন আর সেই ঘোড়ার নাম ছিল জিনাহ্।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

হযরত খাওয়াদ বর্ণনা করেন, একবার আমরা হযরত উমর (রা.)'র সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, সেই কাফেলায় আমাদের সাথে হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফও ছিলেন। মানুষ বলে যে, আমাদেরকে যিরার-এর, অর্থাৎ যিরার বিন খাত্তাব, যিনি কুরাইশদের একজন কবি ছিলেন আর মক্কা বিজয়ের সময় ঈমান এনেছিলেন, তার কবিতার পঙ্‌ক্তি শোনাও। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ খাওয়াদকে স্বরচিত পঙ্‌ক্তি শোনাতে দাও। এরপর আমি কবিতার পঙ্‌ক্তি শোনাতে থাকি, এমনকি প্রভাত হয়ে যায়। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেন, ক্ষান্ত দাও এখন ফজর বা প্রভাতের সময় (হয়ে গেছে)।

(আল আসাবা ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫) (আততাবকাতুল কুবরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত রাবিআ বিন আকসাম। তার ডাকনাম ছিল আবু ইয়াযীদ। হযরত রাবিআ খর্বাকৃতির ও স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি আসাদ বিন খুযায়মা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত রাবিআ মুহাজের সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন, মদীনায় হিজরতে পর তিনি অপর কয়েকজন সাহাবীর সাথে হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের এর কাছে অবস্থান করেন। বদরের যুদ্ধে যোগদানের সময় তার বয়স ছিল ৩০বছর। বদরের যুদ্ধ ছাড়াও তিনি ওহুদ, খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন। আর খায়বারের যুদ্ধেই শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। হারেস নামের এক ইহুদী 'নাত্বা' নামক স্থানে তাকে শহীদ করে। খায়বারে অবস্থিত একটি দুর্গের নাম হল 'নাত্বা'। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩৭ বছর।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৬,৭০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে, তার নাম হলো হযরত রিফা বিন আমর আলজুহনী। তার নাম ওয়াদিয়া বিন আমরও বলা হয়ে থাকে। হযরত রিফা বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের মিত্র ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে, তার নাম হলো হযরত যায়েদ বিন ওদিআ। হযরত যায়েদ আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি উকবার প্রথম বয়আত, বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। আর ওহুদের যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত যায়েদের মাতা ছিলেন উম্মে যায়েদ বিনতে হারেস। তার স্ত্রীর নাম ছিল যয়নব বিনতে সাহাল, যার গর্ভে তার তিন সন্তান- সাদ বিন যায়েদ, উমামা এবং উম্মে কুলসুম-এর জন্ম হয়। তার পুত্র সাদ হযরত ওমরের খিলাফতকালে ইরাকে চলে এসেছিলেন। আর সেখানে আকারকুফ নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। আকারকুফ ইরাকের বাগদাদ শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (মুজামিল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০১)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো, হযরত রিবী বিন রাফে আনসারী। তার দাদার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম ছিল হারেস, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম ছিল যায়েদ। হযরত রিবী বিন রাফে বনু আজলান গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত যায়েদ বিন মুযায়েন। তার পিতার নাম ছিল মুযায়েন বিন কায়েস। হযরত যায়েদের নাম ইয়াযিদ বিন আল মুযায়েনও বর্ণিত হয়েছে। তিনি খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত যায়েদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ এবং হযরত মিসতা বিন উসাসা-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। তার সন্তানদের মাঝে ছিলেন পুত্র আমর এবং কন্যা রামলা।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত ইয়ায বিন যুহায়ের। তার ডাকনাম ছিল আবু সাদ। হযরত ইয়ায এর মাতার নাম ছিল সালামা বিনতে আমের। তিনি ফাহর গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে ফিরে এসে মদীনায় হিজরত করেন। আর হযরত কুলসুম বিন আলহিদাম এর কাছে অবস্থান করেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩০ হিজরী সনে মদীনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তার মৃত্যু হয়েছে সিরিয়ায়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১০-৪১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত রিফা বিন আমর আনসারী। তার ডাকনাম ছিল আবু ওয়ালীদ। হযরত রিফা বনু অউফ বিন খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল উম্মে রিফা। তিনি ৭০জন আনসার সাহাবীর সাথে উকবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর ওহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত যিয়াদ বিন আমর। হযরত যিয়াদকে ইবনে বিশরও বলা হতো। তিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন। হযরত যিয়াদ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাই হযরত যামরা-ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বনু সায়েদা বিন কাব গোত্রের সদস্য ছিলেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বনু সায়েদা বিন কাব বিন আলখাযরাজ এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন।

(আল আসাবা,২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত সালেম বিন উমায়ের বিন সাবেত। হযরত সালেম আনসারদের বনু আমর বিন অউফ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি উকবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত সালেম বদর, ওহুদ, খন্দক এবং সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

তবুকের যুদ্ধের সময় যেসব দরিদ্র সাহাবী মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন এবং যারা তবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন আর বাহন না থাকার কারণে ক্রন্দনরত ছিলেন, হযরত সালেমও সেই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সাতজন দরিদ্র সাহাবী মহানবী (সা.)এর কাছে আসেন, তখন তিনি (সা.) তবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন। এই সাহাবীরা নিবেদন করেন যে, আমাদেরকে বাহন দিন। মহানবী (সা.) বলেন আমার কাছে কোন বাহন নেই যাতে আমি তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি। তারা ফিরে আসেন আর খরচ করার মতো কিছু না থাকার দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আয়াত-

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ(التوبۃ:92)

(সূরা আত্ তওবা: ৯৩)

অর্থাৎ আর তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তখন তোমার কাছে এসেছে যখন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যেন তুমি তাদেরকে কোন বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তখন তুমি তাদেরকে উত্তর দিয়েছ যে, আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে আমি তোমাদের আরোহন করাতে পারি। এই উত্তর শুনে তারা ফিরে যায়। আর এই দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, পরিতাপ! তাদের কাছে খোদার পথে ব্যয় করার মতো কিছুই নেই। ইবনে আব্বাস বলেন, এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মাঝে সালেম বিন উমায়ের এবং সালেবা বিন যায়েদ-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সূরা তওবার এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে, অর্থাৎ যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি যে-

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا

এর তফসীরে তিনি বলেন, এই আয়াতটি আরোপ হওয়ার দিক থেকে যদিও সাধারণ, কিন্তু যে সাত ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা সাতজন দরিদ্র মুসলমান ছিলেন, যারা জিহাদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করার উপায়-উপকরণ তাদের কাছে ছিল না। তারা মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন যে, আমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি দুঃখিত, কেননা আমি কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। তারা তখন খুবই কষ্ট পান। তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে আর তারা ফিরে যান। তিনি বলেন, তাদের ফিরে যাওয়ার পর, বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উসমান তিনটি আর অন্যান্য মুসলমানরা চারটি উট দান করেন। মহানবী (সা.) তাদের প্রত্যেককে একটি করে উট প্রদান করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যেন সেসব দরিদ্র মুসলমানের নিষ্ঠার তুলনা করে দেখানো হয় তাদের সাথে, যারা সম্পদশালী ছিল আর সফরে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে বাহনও ছিল, কিন্তু তারা মিথ্যা অজুহাত সন্ধান করছিল। (অর্থাৎ কিছু লোক এমন ছিল যারা অজুহাত সন্ধান করছিল এবং যায় নি। কিন্তু তারা দরিদ্র হলেও তাদের উচ্ছাস-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, অর্থাৎ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্ণ বাসনা ছিল।) এরপর তিনি আরো বলেন, এছাড়া এই আয়াত থেকে এটিও জানা যায় যে, মদীনায় যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সবাই মুনাফেক ছিল না, বরং তাদের মাঝে নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিল। কিন্তু তারা এজন্য যেতে পারে নি কেননা তাদের কাছে সফরের উপকরণ ছিল না। ”

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর অপ্রকাশিত দরস থেকে থেকে সংগৃহীত, তফসীর সূরা তওবা, আয়াত-৯২)

এর তফসীর করতে গিয়ে তিনি (রা.) আরো বলেন, তাদের নেতা ছিল আবু মূসা। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি তখন মহানবী (সা.) এর কাছে কী চেয়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা উট চাই নি, আমরা ঘোড়াও চাই নি, আমরা শুধু এ কথা বলেছিলাম যে, আমাদের পা খালি, অর্থাৎ পায়ে জুতাও ছিল না। আর পায়ে হেঁটে এত দীর্ঘ সফর করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পায়ে আঘাত পেলে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের এক জোড়া করে জুতা দেওয়া হলে আমরা সেই জুতা পায়ে দিয়েই দৌঁড়ে নিজ ভাইদের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছে যাব।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৬১)

এই ছিল তাদের দারিদ্রতা ও আবেগের চিত্র। হযরত সালেম বিন উমায়ের হযরত মাবিয়ার যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৭, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত সুরাকা বিন কাব। হযরত সুরাকা বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল উমায়রা বিনতে নোমান। হযরত সুরাকা বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত সুরাকা বিন কাব হযরত মাবিয়া-র যুগে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কালবী-র বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুরাকা ইয়ামামা-র যুদ্ধে শহীদ হন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত সায়েব বিন মাযঊন। তিনি হযরত উসমান বিন মাযঊন এর আপন ভাই ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী প্রাথমিক মুহাজেরদের একজন ছিলেন। হযরত সায়েব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

মহানবী (সা.) যখন বুয়াত-এর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন তখন কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) হযরত সাদ বিন মুআয-কে, আর কারো কারো মতে হযরত সায়েব বিন উসমানকে তাঁর (সা.)অনুপস্থিতিতে আমীর নির্ধারণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে হযরত সায়েব বিন মাযঊন-এর নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(আস সীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

হযরত সায়েব মহানবী (সা.) এর সাথে ব্যবসা করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সুনান আবি দাউদ-এ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সায়েব বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হলে সাহাবীরা আমার উল্লেখ এবং প্রশংসা করা আরম্ভ করে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি তাকে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। আমি নিবেদন করলাম যে, **'সাদাকতা বেআবী আনতা ওয়া উম্মী, কুনতা শরীকী, ফানি'মা শরীক, কুনতা লা তুদারী ওয়া লা তুমারী।"** অর্থাৎ আমারা পিতামাতা আপনার জন্য উৎস্বর্গীকৃত, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আপনি ব্যবসার সময় আমার সাথে ছিলেন আর কতই উত্তম অংশীদার ছিলেন! আপনি কোন বিরোধিতাও করতেন না আর বিবাদও করতেন না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৮৩৬)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এই ঘটনাকে এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, মক্কা থেকে বাণিজ্য কাফেলা বিভিন্ন অঞ্চলে যেতো, যেমন- দক্ষিণে ইয়ামেন এবং উত্তরে সিরিয়ায়। অর্থাৎ রীতিমত বাণিজ্যের ধারা চালু ছিল। এছাড়া বাহরাইন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলেও বাণিজ্য করা হতো। মহানবী (সা.) প্রায় এই সবকটি দেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। আর প্রত্যেক বার সততা, বিশ্বস্ততা, উত্তম আচরণ এবং দক্ষতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। মক্কায়ও যাদের সাথে তাঁর মেশার সুযোগ হয়েছে তারা সবাই তাঁর (সা.) প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। অতএব সায়েব নামের একজন সাহাবী ছিলেন, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কেউ কেউ মহানবী (সা.) এর সামনে তার প্রশংসা করে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তাকে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। সায়েব বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি সঠিক বলেছেন। আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎস্বর্গীকৃত। আপনি একবার বাণিজ্যের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন আর আপনি সর্বদা সমস্ত হিসাব নির্বিবাদপূর্ণ রেখেছেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ১০৬)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত আসেম বিন কায়েস। হযরত আসেম বিন কায়েস আনসারদের বনু সালেবা বিন আমর গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১২-১১৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত তোফায়েল বিন মালেক বিন খানসা। হযরত তোফায়েল খাযরাজ গোত্রের বনু আবীদ বিন আদী শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত তোফায়েলের মাতার নাম ছিল আসমা বিনতে আলকায়েন। হযরত তোফায়েল উকাবার বয়আত এবং বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইদাম বিনতে কুরদ-এর সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যার গর্ভ থেকে তার দুই পুত্র -আব্দুল্লাহ্ এবং রবী জন্মগ্রহণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০-৪৩১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ হবে তার নাম হলো হযরত তোফায়েল বিন নোমান। হযরত তোফায়েল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মাতা ছিলেন খানসা বিনতে রিয়াব, যিনি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্-র ফুপি ছিলেন। হযরত তোফায়েলের এক কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল রুবাইয়্যে। তিনি উকবার বয়আত এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত তোফায়েল ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন, আর সেদিন তিনি তেরটি আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত তোফায়েল বিন নোমান খন্দকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন আর এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করেছেন। ওয়াহশী বিন হারব তাকে শহীদ করেছিল। পরবর্তীতে ওয়াহশী মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। ওয়াহশী বলতো যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত হামযাকে এবং হযরত তোফায়েল বিন নোমানকে আমার হাতে সম্মানিত করেছেন কিন্তু আমাকে তাদের হাতে লাঞ্ছিত করেন নি। অর্থাৎ আমি কাফের অবস্থায় নিহত হই নি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯-৮০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত যাহাক বিন আবদে আমর। তিনি বনু দিনার বিন নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আবদে আমর আর তার মাতার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস। তিনি এবং তার ভাই হযরত নোমান বিন আবদে আমর বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত নোমান ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তার তৃতীয় ভাই উতবা বিন আবদে আমর বি'রে মঊনার ঘটনার দিন শহীদ হয়েছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত যাহাক বিন হারেসা। হযরত যাহাক আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল হারেসা এবং মাতার নাম ছিল হিনদ বিনতে মালেক। হযরত যাহাক সত্তরজন আনসারের সাথে উকবার বয়আতে অংশ নেন। তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তার পুত্রের নাম ছিল ইয়াযিদ, যিনি তার স্ত্রী উমামা বিনতে মুআররেস এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত খাল্লাদ বিন সুআয়েদ। তিনি আনসারী ছিলেন। হযরত খাল্লাদ খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস শাখার সদস্য ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল আমরা বিনতে সাদ। তার এক পুত্র হযরত সায়েব মহানবী (সা.) এর সাহচর্য লাভ করেন, আর পরবর্তীতে হযরত ওমর তাকে ইয়ামেন এর আমীরও নিযুক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল হযরত হাকাম বিন খাল্লাদ। তাদের উভয়ের মাতার নাম ছিল লায়লা বিনতে উবাদা। হযরত খাল্লাদ আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনু কুরায়যা-র যুদ্ধে বুনানা নামের এক ইহুদী মহিলা তাকে লক্ষ্য করে উপর থেকে ভারী পাথর ফেলে, যার ফলে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হন। এতে মহানবী (সা.)বলেন যে, খাল্লাদের জন্য দুজন শহীদের সমান প্রতিদান রয়েছে। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেই মহিলাকেও শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০১-৪০২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এই ঘটনার বিবরণ এভাবে রয়েছে যে, কতিপয় মুসলমান ইহুদীদের দুর্গের দেওয়ালের কাছে বিশ্রামের জন্য বসেছিলেন। বুনানা নামের এক ইহুদী মহিলা দুর্গের ওপর থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে একটি ভারী পাথর ফেলে তাদের মাঝ থেকে খাল্লাদ নামের একজনকে শহীদ করে, কিন্তু বাকি মুসলমানরা রক্ষা পায়।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৯৮)

এছাড়া বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাল্লাদের শাহাদত সম্পর্কে যখন তার মা জানতে পারেন, তখন তিনি হিজাব পরিধান করে আসেন। তাকে বলা হয় যে, খাল্লাদকে শহীদ করা হয়েছে আর আপনি হিজাব পরে এসেছেন! তখন তিনি বলেন, খাল্লাদ তো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আমার লজ্জাবোধকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করব না। অর্থাৎ হিজাব ছাড়া আসার যে রীতি ছিল, সেভাবে হবে না, আর হিজাব লজ্জাবোধের

যুগ খলীফার বাণী

"নিজের উন্নত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের জন্য মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করুন।"

(২০১৮ সালে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ারের বাণী)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক আহমদীর উচিত তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সংগ্রাম করা

(২০১৮ সালে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ারের বাণী)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

পরিচয়, তা পালন করা হবে।

এই ঘটনা এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাল্লাদ শহীদ হলে মহানবী (সা.) বলেন, তার জন্য দুজন শহীদের প্রতিদান রয়েছে, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত যে কথা রয়েছে সেটি হলো, যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এমন কেন? অর্থাৎ দুজন শহীদের প্রতিদান কেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, কারণ হলো তাকে একজন আহলে কিতাব শহীদ করেছে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত অউস বিন খওলী আনসারী। তার ডাকনাম ছিল আবু লায়লা। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম বিন গানাম বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল জামিলা বিনতে উবাই, যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল-এর বোন ছিলেন। তার এক কন্যা ছিল, যার নাম ছিল কুসুম। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত সুজা বিন ওহাব আলআসাদি-র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত অউস বিন খওলীকে কামেলীনদের মাঝে গণনা করা হতো। অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই ব্যক্তিকে 'কামেল' বলা হতো যে আরবী লিখতে পারে, ভালো তিরন্দাজি জানে এবং সাতার কাটতে পারে। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় যে পারে তাকে 'কামেল' বলা হতো। আর হযরত অউস বিন খওলী এসবই জানতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৯-৪১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত নাজিয়া বিন আজম বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার সময় যখন মহানবী (সা.) এর কাছে পানীয় জলের সংকটের অভিযোগ করা হয় তখন তিনি আমাকে ডাকেন এবং নিজের তূণ থেকে একটি তির বের করে আমাকে দেন। এরপর তিনি কুয়ার পানি একটি বালতিতে করে নিয়ে আসতে বলেন। আমি তা নিয়ে আসি। তিনি (সা.) ওযু করেন এবং কুলি করে বালতিতে ফেলেন। মানুষ প্রচণ্ড গরম অনুভব করছিল। মুসলমানদের কাছে একটি মাত্র কুয়া ছিল, কেননা মুশরেকরা বালদা নামক স্থানে দ্রুত পৌঁছে পানির উৎসগুলো দখল করে নিয়েছিল। এরপর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, এই বালতির পানি সেই কুয়ায় ঢেলে দাও, যার পানি শুকিয়ে গেছে এবং সেই পানিতে তির গেঁথে দাও। আমি তা-ই করলাম। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি অনেক কষ্টে সেখান থেকে বের হয়েছি। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে মাটি ফেটে পানি বের হতে থাকে। পানি আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিয়েছিল আর এমনভাবে পানি ফুটছিল যেভাবে ডেকচিতে গরম পানি ফুটতে থাকে। এমনকি পানি উপরে উঠে আসে এবং কুয়ার প্রান্ত পর্যন্ত ভর্তি হয়ে যায়। মানুষ কুয়ার প্রান্ত থেকে পানি ভরতে থাকে, এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পিপাসা নিবারণ করে। সেদিন মুনাফিকদের একটি দলও সেই পানির কাছে ছিল, যাদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও ছিল। সে হযরত অউস বিন খওলী-র মামা ছিল। হযরত অউস বিন খওলী তাকে বলেন, হে আবুল খুবাব! তোমার ওপর ধ্বংস নেমে আসুক, অন্তত এখন তো এই নিদর্শনকে মেনে নাও যার সাক্ষী তুমি নিজেও। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর সত্যতাকে গ্রহণ কর। এরপরও কি না মানার আর কোন সুযোগ আছে। তখন সে উত্তর দেয় যে, এমন বহু জিনিস আমি দেখেছি। তখন হযরত অউস বিন খওলী তাকে বলেন, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুন আর তোমার মতামতকে ভুল প্রমাণিত করুন। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই মহানবী (সা.) এর কাছে আসলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে আবুল খুবাব! আজ তুমি যা দেখেছ এমন জিনিস এর পূর্বে তুমি আর কখন দেখেছিলে? (অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাকে তা জিজ্ঞেস করেন।) সে উত্তরে বলে, আমি পূর্বে কখনো এমন জিনিস দেখি নি। মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তুমি সেই কথা কেন বললে। (অর্থাৎ যা সে নিজের ভাতিজাকে বলেছিল।) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই তখন বলে যে, আসতাগফিরুল্লাহ্। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। অতএব মহানবী (সা.) তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

(সুবুল হুদা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৩) (ইমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৯)

হযরত আলী বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) যখন ওমরা করার জন্য মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি অউস বিন খওলী এবং আবু রাফে-কে হযরত আব্বাসের কাছে এই সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন তাঁর (সা.) সাথে হযরত মায়মুনা-র বিয়ে দেন। পথিমধ্যে তাদের উভয়ের উট হারিয়ে যায়। অর্থাৎ তারা কিছুদিন 'বাতনে রাবেক' নামক স্থানে যা 'রাবেক জুহ্‌ফা' থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত, মহনবী (সা.) আগমণ করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এমনকি মহানবী (সা.)সেখানে আগমন করেন। এরপর তারা উভয়ে তাদের উট খুঁজে পান। অতঃপর তারা মহানবী (সা.) এর সাথেই মক্কায় যান। তিনি (সা.) হযরত আব্বাসের কাছে প্রস্তাব পাঠান। হযরত মায়মুনা নিজের বিষয় হযরত আব্বাসের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আব্বাসের কাছে যান এবং হযরত আব্বাস মহানবী (সা.) এর সাথে হযরত মায়মুনা-র বিয়ে দেন।

(শারাহ আল্লামা যুরকানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) (মুজামিল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

মহানবী (সা.) এর ইন্তেকাল হলে হযরত অউস বিন খওলী হযরত আলী বিন আবি তালেবকে বলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি যে, আমাদেরও মহানবী (সা.) এর সেবায় অংশীদার করে নিন। অতএব হযরত আলী তাকে অনুমতি প্রদান করেন। অপর এক বর্ণনায় এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন আর তাঁকে গোসল করানোর সময় আসে, তখন আনসাররা এগিয়ে আসে আর বলে যে, আল্লাহ্ আল্লাহ্, আমরা তাঁর অর্থাৎ মহানবী(সা.) এর নানা বাড়ির লোক, তাই আমাদের মাঝ থেকেও কারো তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা উচিত। আনসারদের বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের মাঝ থেকে কোন এক ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে নাও। তখন তারা হযরত অউস বিন খওলী-কে নির্ধারণ করে। তিনি ভিতরে আসেন আর তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর গোসল এবং দাফন-কাফনে অংশ নেন। তিনি অর্থাৎ হযরত অউস সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি পানির বালতি নিজ হাতে বহন করে আনতেন আর এভাবে (গোসলের জন্য) পানি সরবরাহ করতে থাকেন।

(উসদুল গাবা,১ম খণ্ড, পৃ: ৩২০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আসাবা,১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, তার ভাই কুসুম, মহানবী (সা.)এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শুকরান এবং হযরত অউস বিন খওলী মহানবী (সা.) এর কবরে নেমেছিলেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস- ১৬২৮)

অর্থাৎ কবরে লাশ রাখার জন্য। হযরত অউস বিন খওলী থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) বলেন, হে অউস! যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করেন। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

(মারেফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

অতএব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা, যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। হযরত উসমানের খিলাফতকালে মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়। আল্লাহ্ এই সমস্ত বুযুর্গ সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

ইমামের বাণী

যে ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়াত গ্রহণ করিয়া সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হইয়া স্বীয় কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করিবে। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৯)**

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদাতালার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সে জাহেল, যে তাঁহার মোকাবেলায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, এমন নহে বরং এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। ***(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৯)***

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

জুমআর খুতবা

রসুল ও নবীদের উপর জাদুর প্রভাব পড়া তাদের মর্যাদা পরিপন্থী বিষয়।

যখন সেবকেরই এরূপ মর্যাদা রয়েছে যে, তাঁর ওপর আল্লাহ্ তা'লা সম্মোহন বিদ্যার প্রভাব পড়তে দেন নি, সেখানে প্রভুর সম্পর্কে এই ধারণা করা, অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ কথা মনে করা যে, তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ এক ইহুদীর সম্মোহন বিদ্যার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন, এটি কীভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে?

পবিত্র কুরআন নবীদের ওপর জাদু করার গল্পকে সম্পূর্ণভাবে রহিত করে। মানুষের বিবেকও তা গ্রহণ করে না। হাদীসের শব্দ এই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে যা এর প্রতি আরোপ করা হচ্ছে। আর স্বয়ং সৃষ্টির সেরা ও সবশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.) এর উন্নত মর্যাদা জাদু সংক্রান্ত এই ঘটনার মূলোৎপাটন করছে।

কোন হাদীস যদি পবিত্র কুরআন অথবা মহানবী (সা.) এর পবিত্রতার বিরোধী হয় তাহলে তা বাতিলযোগ্য। *অথবা এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা রয়েছে*

চোখ বন্ধ করে বুখারী এবং মুসলিমকে গ্রহণ করে নেওয়া আমাদের রীতি পরিপন্থী। এটি তো মানুষের বিবেকও গ্রহণ করবে না যে, এমন উন্নত পর্যায়ের নবীর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছে।

জানি না এদের কী হয়েছে, যে নিষ্পাপ নবী (সা.) কে সকল নবীগণ শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র মনে করে আসছে, তারা তাঁর (সা.) নামে এমনসব কথা বলে!

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা যুগ ইমামকে মানার কারণে মহানবী (সা.) এর মাকাম এবং মর্যাদাকে জানি এবং অনুধাবন করি।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।

আঁ হযরত (সা.)-এর উপর কি কোন জাদুর প্রভাব পড়েছিল?

.আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র সত্তার উপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু করার অপবাদ খণ্ডন, এর বাস্তবতা এবং জামাত আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ বিবরণ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৮ মার্চ, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৮ আমান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত কায়েস বিন মিহসান একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। অনেক রেওয়ায়েতে তার নাম হযরত কায়েস বিন হাসানও বর্ণিত হয়েছে। তিনি আনসারদের বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল আনীসা বিনতে কায়েস। আর তার পিতা ছিলেন মিহসান বিন খালেদ। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। তার মেয়ে ছিল উম্মে সা'দ বিনতে কায়েস। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার সন্তানরা মদীনায় ছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত জুবায়ের বিন আইয়ায। তার পিতার নাম ছিল আইয়ায বিন খালেদ। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু যুরায়েক এর সদস্য ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বলেন, তার নাম ছিল জুবায়ের বিন ইলিয়াস। অপর এক বর্ণনায় তার নাম জুবায়ের বিন ইয়্যাসও বর্ণিত হয়েছে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর নাঊযুবিল্লাহ্ কোন ইহুদী জাদু-টোনা করেছিল আর তাঁর (সা.) ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। কিছু রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, চিরুনি এবং চুলের ওপর তারা জাদু করে তা উরওয়ান (নামক) কূপে ফেলে দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেখানে গিয়ে তা বের করেছিলেন। সহীহ্ বুখারীর শরাহ্ (বা ভাষ্য) ফতহুল বারী-তে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জুবায়ের বিন ইয়্যাস উরওয়ান কূপ থেকে সেই চিরুনি ও চুল তুলে এনেছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত কায়েস বিন মিহসান তা তুলে এনেছিলেন।

(ইমাম ইবনে হিজর সংকলিত ফাতহুল বারি, হাদীস-৫৭৬৩, খণ্ড-১০, পৃ: ২৮২, প্রকাশক কাদিমী কুতুব খানা করাচি)

এ কারণে এই দুই সাহাবীর বিবরণ আমি একত্র করেছি। এই দুইজনের যে-ই সেসব জিনিস তুলে এনে থাকুন, তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আসল কথা হলো, মহানবী (সা.)-এর ওপর আসলেই কোন জাদুর প্রভাব পড়েছিল কি? আসল ঘটনা কী আর এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? আর এটি আমাদের জানা থাকা উচিৎ। যে কথার ফলে মহানবী (সা.)-এর সত্তার প্রতি আপত্তি উঠতে পারে অথবা মানুষ আপত্তি করে তার উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে, তাই আমি এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি যা জামা'তের বই-পুস্তকে সংরক্ষিত আছে। এই উভয় সাহাবীর বরাতে আজ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা ফালাকের তফসীরের ভূমিকায় এই ঘটনার উল্লেখপূর্বক উক্ত সূরা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, অনেকের ধারণা হলো সূরা ফালাক ও সূরা নাস অথবা শেষ দু'টি সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অনেকে আবার একে মাদানী সূরা বলে অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (রা.) লিখেন, যারা একথার পক্ষে যে, এই সূরা দু'টি মাদানী, তাদের দলীল হলো, এই সূরা এবং এর পরের সূরাটির সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর সেই রোগের সাথে যেক্ষেত্রে মনে করা হয়েছিল যে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাঁর

(সা.) ওপর জাদু-টোনা করা হয়েছে। সে সময় এই সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয় আর তিনি (সা.) তা পাঠ করে ফুঁ দেন। তিনি (রা.) বলেন, "একথা বলা হয় আর তফসীরকারকগণ বলেন যে, এই ঘটনাটি যেহেতু মদীনায় ঘটেছিল তাই সূরা ফালাক এবং সূরা নাস মাদানী সূরা। যাহোক এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, এ সূরা দু'টি মাদানী সূরা অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, এটি তফসীরকারকদের একটি যুক্তি,ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নয়, যদিও আমাদের কাছেও এরূপ কোন অকাট্য সাক্ষ্য নেই যার ভিত্তিতে আমরা একথা বলতে পারি যে, এগুলো মক্কী সূরা। কিন্তু যে যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা-ও দুর্বল এবং অসার, কেননা এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হলেও তো মহানবী (সা.) অসুস্থাবস্থায় এটি পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁ দিতে পারতেন। কাজেই শুধুমাত্র ফুঁ দেওয়ার কারণে এটি মনে করা যে, এগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, এই যুক্তি যথার্থ নয়।"

"মহানবী (সা.)-এর অসুস্থ হওয়া আর মানুষের এটি মনে করা যে, তাঁর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু-টোনা করা হয়েছে-এ ঘটনাটি যেসব শব্দে বর্ণিত হয়েছে তার বাক্যাবলী সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর তফসীরের ভূমিকায় অর্থাৎ সূরার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে যে শব্দমালা লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলো হলো, তিনি লিখেন, "তফসীরকারকগণ যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.)'র রেওয়ায়েতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এ জন্য আমরা শুধুমাত্র এই রেওয়ায়েতটির অনুবাদ করছি। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু-টোনা করা হয়েছে আর এর এতটাই প্রভাব পড়েছে যে, তিনি (সা.) অনেক সময় মনে করতেন যে, তিনি অমুক কাজ করেছেন অথচ তিনি সেই কাজ করেন নি। একদিন অথবা এক রাত মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করেন, আবার দোয়া করেন, পুনরায় দোয়া করেন এরপর বলেন, "হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমি যা চেয়েছিলাম তা তিনি আমাকে দান করেছেন।" হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি যা চেয়েছিলেন তা কী? আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কী দিয়েছেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, "আমার কাছে দু'ব্যক্তি আসে এবং তাদের একজন আমার শিয়রের কাছে বসে আর অপরজন আমার পায়ের কাছে। এরপর সেই ব্যক্তি যে আমার শিয়রের পাশে বসেছিল সে আমার পায়ের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্বক বলে অথবা সম্ভবত একথা বলে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অথবা একথা বলে যে, পায়ের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলে যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কী কষ্ট? তখন দ্বিতীয় জন উত্তর দেয় যে, তাকে জাদু-টোনা করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, কে জাদু করেছে? তখন সে উত্তরে বলে, এক ইহুদী লবীদ বিন আসেম করেছে। তখন প্রথমজন বলে, কি দিয়ে জাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয়জন উত্তর দেয় যে, চিরুনি এবং মাথার চুল দিয়ে যা খেজুরের গুচ্ছের মাঝে রয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করে, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয়জন বলে, এগুলো যী-উরওয়ান এর কূপের মাঝে রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এরপর তাঁর সাহাদীদের নিয়ে সেই কূপের কাছে যান এবং ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্র কসম! কূপের পানিকে মেহেন্দীর রসের মত লাল দেখাচ্ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, মনে হয় ইহুদীদের মধ্যে এই প্রচলন ছিল যে, যখন তারা কারো ওপর জাদু-টোনা করতো তখন মেহেন্দী বা এই ধরনের কোন বস্তু পানিতে মিশিয়ে দিত এটি বুঝানোর জন্য যে, জাদুবলে এই পানিকে লাল করা হয়েছে। এভাবে তারা একটি বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতো সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, সেখানকার খেজুরগুলো এমন ছিল যেন শয়তান অর্থাৎ সাপের মাথার মতো। এক্ষেত্রে খেজুর-ছড়াকে সাপের মাথার সদৃশ বলা হয়েছে, অর্থাৎ থোকা থোকা খেজুর ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যেগুলোর ওপর জাদু করা হয়েছিল আপনি সেই জিনিসগুলো পুড়িয়ে দিলেন না কেন? মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে আরোগ্য দান করেছেন তখন আমি এমন কোন কাজ করা পছন্দ করি নি যদ্বারা অনিষ্ট মাথাচাড়া দেয়, তাই আমি সেসব বস্তু পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি, অতএব তা (মাটিতে) পুঁতে ফেলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.)'র বর্ণনা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, এই বর্ণনায় যে দু'জন পুরুষের উল্লেখ রয়েছে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। সম্ভবত তারা ফেরেশতা ছিলেন, যাদেরকে মহানবী (সা.) দেখেছেন। যদি তারা মানুষ হতেন তাহলে হযরত আয়েশা (রা.)ও তাদের দেখতে পেতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক যা বর্ণিত হয়েছে এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাদের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন যে, ইহুদীরা তাঁর ওপর জাদু-টোনা করেছে। এর অর্থ এটি নয় যে, যেভাবে জাদুর প্রভাব পড়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছিল। এরপর তিনি (রা.) বলেন, যাহোক, মহানবী (সা.) যখন তাদের জাদু-টোনার বস্তু (কূপ থেকে) তুলে এনে পুঁতে ফেলেন তখন ইহুদীরা মনে করে যে, তারা যে জাদু-টোনা করেছিল তা অকার্যকর হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আরোগ্যও দান করেন। সারকথা হলো, ইহুদীরা এ বিশ্বাস পোষণ করতো যে, তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদু-টোনা করেছে, এ কারণে স্বভাবতই তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ থাকে যে, তিনি অসুস্থ হবেন। তিনি (রা.) বলেন, এই রেওয়ায়েত থেকে যেখানে ইহুদিদের সেই শত্রুতার কথা জানা যায় যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের ছিল, সেখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসূল ছিলেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সেসব বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে যা ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে করছিল। অতএব অদৃশ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর (সা.) জ্ঞাত হওয়া আর ইহুদীদের নিজেদের দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হওয়া তাঁর (সা.) সত্য রসূল হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল।"

(তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৯-৫৪২)

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে এর অর্থ করেছেন সেটিই সঠিক, তা হলো- ইহুদীরা নিজেদের ধারণানুসারে মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদু-টোনা করেছিল কিন্তু এর কোন প্রভাব পড়েনি। আর অসুখটি ছিলো বিস্মৃতি রোগ অথবা যে অসুখই হোক না কেন এর অন্য কোন কারণ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জ্ঞাত করে বাহ্যিকভাবেও তাদের যে ধারণা ছিল যে, তারা জাদু করেছে তারও অপনোদন করেছেন বা তা-ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর তাঁর (সা.) অসুখ দেখে ইহুদীরা যে নিজেদের ধারণানুসারে আনন্দিত হচ্ছিল বা একথা ছড়াচ্ছিল, অর্থাৎ একথা বলতো যে, আমাদের জাদুর প্রভাবেই এই রোগ দেখা দিয়েছে- এর রহস্যও উন্মোচিত হয়।

এরপর আমাদের বই-পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের একটি প্রবন্ধ রয়েছে, যাতে এই ঘটনা সম্পর্কে সবিস্তারে ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। যা এই ঘটনাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে। তিনি লিখেন, ইতিহাস বরং বিভিন্ন হাদীসে পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.)-এর ওপর (নাঊযুবিল্লাহ্) একবার ইহুদী জাতির এক মুনাফিক লবীদ বিন আসেম জাদু-টোনা করেছিল, আর এই জাদু এভাবে করা হয় যে, একটি চিরুনিতে চুল গিঁট দিয়ে এবং এর ওপর কিছু পড়ে এটিকে একটি কূপের মধ্যে পুঁতে রাখে। তিনি (রা.) বলেন, আর বলা হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) দীর্ঘদিন এই জাদুতে আক্রান্ত ছিলেন। তারা এই গুজব রটিয়ে দিয়েছিল। এ সময়কালে তিনি (সা.) অধিকাংশ সময় উদাস এবং বিষন্ন হয়ে থাকতেন আর শঙ্কিত হয়ে বার বার দোয়া পড়তেন এবং এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল, তাঁকে (সা.) সেই দিনগুলোতে অনেক বেশি বিস্মৃতি রোগে ধরেছিল। তিনি তখন বিভিন্ন জিনিস ভুলে যেতেন, এমনকি অনেক সময় তিনি মনে করতেন যে, আমি অমুক কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু আসলে তিনি সেই কাজটি করেন নি। অথবা অনেক সময় তিনি মনে করতেন যে, আমি আমার অমুক স্ত্রীর ঘর থেকে হয়ে এসেছি কিন্তু আসলে তিনি তার ঘরে যান নি। তিনি এর ব্যাখ্যা করেন যে, এ সম্পর্কে এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তিনি তাঁর স্ত্রীদের জন্য পালা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন আর সবশেষে সেই স্ত্রীর ঘরে চলে যেতেন যার সেদিন পালা হতো। উপরোক্ত বর্ণনায় এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (যাহোক, এই বিবরণ চলছে।) অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এটি তার সারাংশ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার বিবরণ বা তফসীরে বুখারীর যে রেওয়ায়েত রয়েছে তার সারাংশ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (রা.) লিখেন, এই হলো সেই রেওয়ায়েতের সারাংশ যা ইতিহাস এবং হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই রেওয়ায়েতকে ঘিরে এমন কল্প-কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে যে, আসল ঘটনা উদঘাটন করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে এমন এমন আজগুবি গল্প বানানো হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি তা জানা কঠিন হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, যদি এই সব রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হয় তাহলে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র এবং কল্যাণময় সত্তা এরূপ প্রমাণিত হয় যেন তিনি একজন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যাকে নিদেনপক্ষে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে হলেও তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা স্বীয় জাদুবলে যে ধাঁচে চাইতো গড়তে পারতো, আর এভাবে তারা তাঁকে নিজেদের অপবিত্র মনোযোগের লক্ষ্যে পরিণত করে তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করতো, আর নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি এই জাদুর মোকাবিলায় নিজেকে অসহায় অবস্থায় পেতেন। এই রেওয়ায়েতটিকে যদি এভাবে বর্ণনা করা হয় যেভাবে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তাহলে এমন ফলাফল দাঁড়াবে যা একেবারেই ভুল, এমনটি হতেই পারে না, কিন্তু যদি

এসব রেওয়ায়েত সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও যথার্থরূপে চিন্তা করা হয় আর গবেষণাধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, (রীতিমত যদি গবেষণা করা হয় আর অনুসন্ধান করা হয় তাহলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে) এটি শুধুমাত্র বিস্মৃতির একটি রোগ ছিল, যাতে সাময়িক বিভিন্ন শঙ্কা বা উদ্বেগ এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে কিছু সময়ের জন্য তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, যাকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় পরশ্রীকাতর শত্রু একথা চাউর করে দিয়েছিল যে, আমরা মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু করেছি, নাঊযুবিল্লাহ্। কিন্তু খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-কে আশু আরোগ্য দান করে শত্রুদের মুখ কালো করে দিয়েছেন আর কপটদের মিথ্যা অপপ্রচারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বজুড়ে শয়তানী শক্তির ওপর মহান বিজয়ী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যার চেয়ে বড় তাগুতী বা শয়তানী শক্তিসমূহের মুণ্ডপাতকারী না আজ পর্যন্ত কেউ জন্ম নিয়েছে আর না ভবিষ্যতে কেউ জন্ম নিবে, তাঁর সম্পর্কে এটি মনে করা যে, তিনি এক ইহুদীর শয়তানী জাদুর লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন, এটি মানব-বুদ্ধির চরম অপব্যবহার, (এটি চিন্তাও করা যেতে পারে না,) আর এটি শুধু আমাদের দাবিই নয় বরং স্বয়ং বিশ্বজগতের যিনি নেতা, (যার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত) তিনিও এটি রদ করেছেন।

একটি হাদীস দ্বারা(ও) এটি সুস্পষ্ট হয়। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার সাথে শয়তান আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) তার নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন যে, আমার সাথে শয়তান আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। আমি জিজ্ঞেস করি, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান লেগে আছে? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। হযরত আয়েশা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সাথেও কি কোন শয়তান লেগে আছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু খোদা তা'লা আমাকে শয়তানের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, এমনকি আমার শয়তানও মুসলমান হয়ে গেছে।

(সহী মুসলিম, কিতাব সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়াল জান্নাতু ওয়ান্নার, হাদীস)

এরূপ সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল বক্তব্য থাকার পরও কি এই ধারণা করা যেতে পারে যে, কোন কপট ইহুদী, নিজের শয়তানের সাহায্যে মহানবী (সা.)-এর মতো সুমহান মর্যাদার অধিকারীর ওপর জাদু-টোনা করবে আর তিনি সেই শয়তানী জাদুতে প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শোকার্ত ও অসুস্থ থাকবেন?

মিথ্যাবাদীরা সকল যুগেই সত্যের মোকাবিলায় এমন মিথ্যা ও অসার অস্ত্র ব্যবহার করে এসেছে, কিন্তু মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী খোদা এমন সকল মিথ্যার জাল ছিন্ন করেছেন, যেমনটি তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ (সূরা মুজাদেলাহ: ২৩)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এটি লিখে রেখেছেন আর নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, সকল রসূলের যুগে আমি এবং আমার রসূলই বিজয়ী হব। আর কোন শয়তানী ষড়যন্ত্র আমাদের মোকাবেলায় সফল হতে পারবে না।

তিনি লিখেন, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, সেই ঘটনার বাস্তবতা কী যা সহীহ বুখারীতে পর্যন্ত হযরত আয়েশার বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে? অতএব যদি ঘটনার পূর্বাপর এবং ইহুদী ও মুনাফেকদের কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রণিধান করা হয় তাহলে এই ঘটনার বাস্তবতাকে বোঝা বা অনুধাবন করা খুব কঠিন থাকে না। সর্বপ্রথম জেনে রাখা উচিত যে, ধারণাপ্রসূত জাদুর এই ঘটনাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। তাবাকাত ইবনে সাদ-এ এটি লেখা আছে, যাতে মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইশদের বাধা দেওয়ার কারণে বাহ্যত বিফল হয়ে ফিরতে হয়। এই আপাত ব্যর্থতা এমন এক আঘাত ছিল যার কারণে কাফের এবং মুনাফেকদের পক্ষ থেকে তো হাসিঠাট্টা এবং বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করারই ছিল, কিন্তু কতিপয় নিষ্ঠাবান মুসলমান, এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) এর মতো উন্নত পর্যায়ের বুযুর্গও এই আপাত ব্যর্থতার কারণে সাময়িকভাবে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলেন। বুখারীতে এটিও লেখা আছে অর্থাৎ এই বর্ণনাটি বুখারীর হাদীস যে, এসব পরিস্থিতির ফলে দুর্বল চিত্তের লোকদের পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার দুশ্চিন্তায় মহানবী (সা.) এর ওপর স্বভাবতই প্রবল মানসিক চাপ ছিল এবং কিছুকাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এর আবশ্যিক প্রভাব তাঁর (সা.) স্বাস্থ্যের ওপরও পড়েছে। আর এই দুশ্চিন্তার ফলে তিনি (সা.) খোদা তা'লার সমীপে অনেক বেশি দোয়াও করতেন, যেমনটি হাদীসের শব্দ 'দাআ ওয়া দাআ'-তে ইঙ্গিত রয়েছে, যেন হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার কারণে ইসলামের উন্নতির ক্ষেত্রে কোন সাময়িক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয়। এটি সেরূপ দোয়াই ছিল যেমনটি তিনি (সা.) বদরের ময়দানে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যকে দেখে করেছিলেন যে, **'আল্লাহুম্মা ইন তাহলিক হাযিহিল ইসাবাতা লা তু'বাদু ফিল আরযে'।**

এসব কারণে তাঁর (সা.)স্নায়ু এবং স্মরণশক্তির ওপর গভীর প্রভাব পড়েছিল আর তিনি কিছু সময়ের জন্য বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটি এক, দুই বা চার দিন হবে, অথবা দুই দিন হবে কিংবা এক দিন ও এক রাতের জন্য হবে, কিন্তু যাহোক,যত দিনের জন্যই হোক, কিছুটা প্রভাব পড়েছে, যা এক অবিনার্য প্রভাব ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ফলাফল বের করেছেন যে, তা কয়েক দিনের জন্য ছিল আর এর কারণ ছিল সেই দুশ্চিন্তা যা মুসলমানদের ঈমানে দুর্বলতার আশঙ্কার কারণে তাঁর (সা.) ছিল, এটি এক অপরিহার্য মানবিক দিক যা থেকে খোদার নবীরাও মুক্ত নন। ইহুদী এবং মুনাফেকরা যখন এটি দেখে যে, মহানবী (সা.) আজকাল অসুস্থ আছেন আর স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে তিনি আবশ্যিকভাবে বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত, তখন তারা অভ্যাস অনুযায়ী নৈরাজ্যের উদ্দেশ্যে এ কথা প্রচার করা আরম্ভ করে যে, আমরা নাঊযুবিল্লাহ্ মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু-টোনা করেছি, আর তাঁর এই বিস্মৃতির রোগ সেই জাদুরই ফলাফল। সেইসাথে তারা তাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বাহ্যিক নিদর্শন হিসেবে কোন চিরুনিতে চুলের গিট ইত্যাদি দিয়ে একটি কুয়ায় তা পুঁতে রাখে।

তাদের এই ধারণাপ্রসূত জাদুর সংবাদ যখন মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি এই নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে আরো দোয়া করেন। আর যেমনটি হযরত আয়েশা বলেছেন যে, এই সংবাদ লাভের পর তিনি এক দিন বা এক রাত অনেক বেশি দোয়া করেন এবং নিজের ঊর্ধ্বলোকের প্রভুর কাছে যাচনা করেন যেন তিনি এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর নাম এবং তার ধারণাপ্রসূত এই জাদুর পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন যেন তিনি এই মিথ্যা জাদুকে সমূলে উৎপাটন করতে পারেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ব্যকুল চিত্তের দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন আর স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রকৃত বিষয় উন্মোচন করেন।

পবিত্র কুরআনের নীতিগত ঘোষণা যে, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى (সূরা তাহা: ৭০) অর্থাৎ নবীদের বিপরীতে কোন জাদুকর কোন পরিস্থিতিতেই সফল হতে পারে না, তা সে যেভাবে আর যে দিক থেকেই হামলা করুক না কেন। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের এই অকাট্য সিদ্ধান্তের আলোকে যে, يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (সূরা বনি ইসরাঈল: ৪৮) অর্থাৎ যালেমরা বলে যে, তোমরা কেবল এমন একজনের অনুবর্তীতা করছ যে জাদুগ্রস্ত। একথা কুরআন শরীফে লেখা আছে যে, কাফেররা এটিই বলেছিল। এছাড়া স্বয়ং এই হাদীসের শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং আরবী পরিভাষার প্রতি প্রণিধান করলে বুখারীর এই বর্ণনাটি নিশ্চিতভাবে ঘটনার প্রতিপাদ্য (হাকায়েত আনিল গায়ের) রূপে ধরে নিতে হবে যেখানে **'হাকায়েত আনিল গায়র'**-এর অর্থ হলো বাহ্যত বক্তা নিজের পক্ষ থেকে কথা বললেও এর প্রকৃত অর্থ এটি হয়ে থাকে যে, অন্যরা এই কথা বলে, অর্থাৎ অপরের কথা বর্ণনা করা হয়। এভাবে এই রেওয়ায়েত যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) এর ওপর জাদু-টোনা করা হয়- এর অর্থ হলো,শত্রুরা এ কথা প্রচার করেছে যে, তাঁর (সা.) ওপর জাদু-টোনা করা হয়েছে, হযরত আয়েশা নিজে এ কথা বলেন নি। অর্থাৎ এর অনুবাদ হবে যে, শত্রুরা এ কথা প্রচার করেছে যে, তাঁর (সা.) ওপর জাদু করা হয়েছে। এমনকি সেই দিনগুলোতে তিনি (সা.) অনেক সময় এটি মনে করতেন যে, তিনি অমুক কাজ করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেন নি। অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, তিনি (সা.) অনেক সময় মনে করতেন যে, আমি আমার অমুক স্ত্রীর ঘরে গিয়েছিলাম, অথচ তিনি সেই স্ত্রীর ঘরে যান নি। হযরত আয়েশার বর্ণনা হলো- সেই দিনগুলোতেই তিনি (সা.) একদিন আমার ঘরে ছিলেন, আর দুশ্চিন্তার কারণে তিনি বারংবার আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছিলেন। সেই দোয়ার পর তিনি (সা.) আমাকে বলেন যে, হে আয়েশা! তুমি কি জান, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেই কথা অবহিত করেছেন যা আমি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই কথা কী? তিনি (সা.) বলেন, স্বপ্নে (বা কাশফের অবস্থায়) আমার কাছে দুই ব্যক্তি আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে বসে পড়ে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে যায়। এরপর তাদের একজন অপরজনকে

যুগ ইমামের বাণী

যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহা হইলে মার খাইয়াও তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে, গালি শুনিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তির কী কষ্ট? হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, তাদের কথা বলার ভঙ্গি 'হাকায়েত আনিল গায়র' অর্থাৎ অপরের প্রেক্ষিতে কথা বলার দিকে ইঙ্গিত করছে। আর এরপর সেই দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর কষ্ট হলো অমুক ইহুদী তাঁর ওপর জাদু করেছে আর এটি তারই প্রভাব- মানুষ এই কথা বলছে। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই স্বপ্ন বা কাশফের পর তিনি নিজের কতিপয় সাহাবীর সাথে সেই কুয়ার কাছে যান এবং তা পর্যবেক্ষণ করেন। তাতে কিছু খেজুর গাছ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ অন্ধকার এক কূপ ছিল। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আয়েশার কাছে ফিরে আসেন এবং তাকে বলেন, হে আয়েশা! আমি সেটি দেখে এসেছি। এই কূপের পানি মেহেন্দী মিশ্রিত পানির ন্যায় লাল বর্ণ ধারণ করছে। ইহুদীদের রীতি ছিল যে, মানুষকে প্রতারিত করার জন্য, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, এভাবে কুয়ার পানিকে রাঙিয়ে দিত আর তা খেজুর বৃক্ষ বা যক্কুম বৃক্ষের ন্যায় কুৎসিত দেখা যেতো। হযরত আয়েশা বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করি যে, আপনি সেই চিরুনি ইত্যাদি বাইরে বের করে ফেলে দেননি কেন? কতিপয় রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে জ্বালিয়ে বা পুড়িয়ে দেননি কেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আরোগ্য দান করেছেন,তাহলে আমি তা বাইরে নিক্ষেপ করে একটি মন্দ বিষয়কে কেন প্রচার করব (যার কারণে দুর্বল চিত্তের মানুষের মাঝে অযথা জাদুর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে।) অতএব সেই কূপে মাটি ফেলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, স্মরণ রাখা উচিত যে, 'হাকায়েত আনিল গায়র' অর্থাৎ অন্যের বরাতে যখন কথা বলা হয় অথবা অন্যের কথাকে যখন পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়, আরবদের মাঝে এর এই রীতি প্রচলিত ছিল, বরং পবিত্র কুরআনেও কোন কোন স্থানে এই বচনভঙ্গিকে অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব এক স্থানে জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (সূরা দুখান: ৫০) অর্থাৎ হে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি! তুমি খোদার এই শাস্তি ভোগ কর, যদিও বা তুমি অনেক সম্মানিত ও ভদ্র ব্যক্তি।

এখানে এর অর্থ মোটেও এটি নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামবাসীদেরকে সম্মানিত ও ভদ্র মনে করেন, বরং 'হাকায়েত আনিল গায়র' অনুযায়ী এর অর্থ হলো হে সেই ব্যক্তি! যাকে তার সঙ্গী-সাথি এবং সে নিজে সম্মানিত এবং ভদ্র মনে করতো, (পৃথিবীতে মন্দ কাজ করার পর মনে করতো যে, আমরা অনেক সম্মানিত ব্যক্তি) তুমি এখন খোদার আগুনের শাস্তি ভোগ কর। হুবহু সেই একই ভঙ্গী এই স্বপ্নে সেই দুই ব্যক্তি বা দুই ফেরেশতা অবলম্বন করেছে, যাদেরকে মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন। অতএব তারা যখন এই কথা বলেছে যে, এই ব্যক্তির ওপর জাদু করা হয়েছে, তখন তাদের কথার অর্থ এটি ছিল না যে, আমাদের ধারণা অনুযায়ী জাদু করা হয়েছে, বরং অর্থ ছিল মানুষ বলে যে, তাকে জাদু করা হয়েছে, আর স্বপ্নের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটি ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, এই কুচক্রীরা সেই কূপে যে জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল এবং যার মাধ্যমে তারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতারিত করত, (অর্থাৎ তারা যে নিজেদের মতো করে লোকদের ধোঁকা দিচ্ছিল এবং মিথ্যা প্রচার করছিল আর মুনাফেকদের মাঝে মিথ্যাচার করছিল) সেটি যেন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূলের কাছে প্রকাশ করে দেন, যেন তাদের ধারণাপ্রসূত জাদুকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। অতএব এমনটিই হয়েছে, তাদের জাদুর জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ারকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সেই কূপটি মাটি ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর এর আবশ্যিক ফলাফলরূপে মহানবী (সা.) এর এই প্রকৃতিগত দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যায় যে, দুষ্কৃতিপরায়ণরা এরূপ কুকর্ম করে সরল প্রকৃতির লোকদের ধোঁকা দিতে চায়। আর এই ঐশী প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হয় যে, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (সূরা তাহা: ৭০)। অর্থাৎ এক জাদুকর যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, সে খোদার এক নবীর মোকাবেলায় কখনো সফল হতে পারবে না।

যাহোক উপরোক্ত হাদীস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়

প্রথমত- হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার পর এর কারণে প্রকৃতিগতভাবে মহানবী (সা.) অন্যদের হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি কতিপয় জাগতিক বিষয়াদি যা গৃহস্থালী সম্পর্কিত, সেগুলো ভুলে যেতেন।

দ্বিতীয়ত- তাঁর (সা.) এর এই অবস্থা দেখে ইহুদী এবং মুনাফেকরা, যারা সর্বদা এমনসব বিষয়কে ঢাল বানিয়ে ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার দুর্নাম করতে চাইতো, এই গোপন প্রচার আরম্ভ করে যে, আমরা নাঊযুবিল্লাহ্ মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু করেছি। তাদের এই প্রচার তেমনই ছিল যেমনটি তারা বনী মুসতালিক-এর যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.)-র পেছনে রয়ে যাওয়ার কারণে তার দুর্নাম করা আরম্ভ করেছিল আর এভাবে মহানবী (সা.) এর জীবন অতিষ্ঠ করার অপবিত্র প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

তৃতীয়ত- এই ধারণাপ্রসূত জাদুর বাহ্যিক লক্ষণ হিসেবে, যেন সরল প্রকৃতির মানুষকে আরো সহজে ধোঁকায় ফেলা যায়, এই দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকেরা ইহুদী বংশীয় এক মুনাফেক লাবিদ বিন আসেম এর মাধ্যমে নিজেদের রীতি অনুযায়ী একটি চিরুনিতে কিছু চুল পেঁচিয়ে সেটিকে কূপের মাঝে নিক্ষেপ করে আর এটি নিয়ে গোপন চর্চা আরম্ভ হয়ে যায়, যা মহানবী (সা.) এর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধির কারণ হয়।

চতুর্থত- এর জন্য মহানবী (সা.) বিগলিত চিত্তে খোদা তা'লার কাছে দোয়া করেন যে, হে খোদা! তুমি নিজ কৃপায় এই নৈরাজ্যকে প্রতিহত কর আর আমার কাছে বাস্তবতা প্রকাশ কর যেন আমি এই নৈরাজ্যের সংশোধন করে সরল প্রকৃতির মানুষ গুলোকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি। অতএব সেই দোয়া গৃহীত হয়ে তা প্রকাশিত হয়ে যায়।

পঞ্চম বিষয় হলো- আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) সেই দোয়া কবুল করেন আর লাবিদ বিন আসেম এর ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করে দেন। তখন তিনি কয়েকজন সাক্ষী সাথে নিয়ে সেই কূপের কাছে যান আর সেই চিরুনিকে মাটিতে মিশিয়ে দেন, বরং সেই কূপটিকে পর্যন্ত বন্ধ করে দেন যেন বাঁশও না থাকে আর বাশিও না বাজে।

বাকি রইলো এই প্রশ্ন যে, মহানবী (সা.), যিনি খোদা তা'লার এক মহামর্যাদাবান নবী বরং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন ছিলেন, তিনি বিস্মৃতির রোগে কেন আক্রান্ত হলেন, যা বাহ্যত নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক নবীর দুই প্রকার ব্যক্তিত্ব থাকে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খোদার নবী এবং রসূল হয়ে থাকেন, যার কারণে তিনি খোদার বাণী লাভের সম্মানে সম্মানীত হন, আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে নিজ অনুসারীদের গুরু বা শিক্ষক আখ্যায়িত হন এবং তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হন। আর অপর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষের মাঝ থেকে কেবল একজন মানুষই হয়ে থাকেন। আর সকল প্রকার মানবিক চাহিদা ও প্রকৃতিগত বিপদের অধীনস্ত হয়ে থাকেন যা অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.) কে সম্বোধন করে বলেছেন- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (সূরা কাহাফ: ১১১)অর্থাৎ হে রসূল! তুমি মানুষকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ আর সেই সমস্ত নিয়মের অধীনস্ত যা অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তবে হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার এক রসূলও বটে। আর খোদার পক্ষ থেকে খোদার সৃষ্টির হেদায়েতের জন্য ওহী এবং ইলহাম প্রাপ্ত হয়েছি। এটি এর ব্যখ্যামূলক অনুবাদ।

এই সূক্ষ্ম আয়াতটিতে নবীদের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বা সত্তাকে অতি উন্নতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক দিক থেকে তাদেরকে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট করা হয়েছে আর অপর দিক থেকে তাদেরকে সাধারণ মানুষের গণ্ডি থেকে বাহিরে বের হতে দেওয়া হয় নি। অতএব যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবীরা মানবিক চাহিদা ও প্রকৃতিগত বিপদের ঊর্ধ্বে থাকে, সে মিথ্যাবাদী। নিশ্চিতভাবে নবীরাও সেভাবেই রোগাক্রান্ত হন যেভাবে সাধারণ মানুষ অসুস্থ হয়। হযরত মিয়া বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, প্রসঙ্গক্রমে এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্যিক যেসব লক্ষণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী হাদীস এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) টাইফয়েডের কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ম্যালেরিয়া, জ্বর, টাইফয়েড, ফুসফুসের সংক্রমণ, ক্ষয়-জ্বর, শ্বাসকষ্ট, সর্দি, কাশি, গেঁটেবাত, মাথাঘোরা, স্নায়ুর কষ্ট, অতিসংবেদনশীলতা, হতাশা, অস্থিরতা, মানসিক আঘাত, বিস্মৃতি, বিপদাপদে নিপতিত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত আঘাত, ক্ষত, যুদ্ধের জখম ইত্যাদি সবকিছুর কবলেই এক নবী নিপতিত হতে পারে এবং নিপতিত হয়ে এসেছে। শুধুমাত্র যদি কোন বিশেষ নবীকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ব্যতিক্রমীভাবে কোন বিশেষ ব্যাধি থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। যদি এখানে কারো এই ধারণা জাগে যে, পবিত্র কুরআন তো মহানবী (সা.) সম্পর্কে ঘোষণা করেছে যে, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ (সূরা আলা: ৭)। অর্থাৎ আমরা তোমাকে এমন এক শিক্ষা প্রদান করব যা তুমি বিস্মৃত হবে না। তাহলে তিনি (সা.) কীভাবে বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হলেন। এর উত্তরে ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই প্রতিশ্রুতি কেবল কুরআনী ওহী সম্পর্কে দেয়া হয়েছে, সাধারণভাবে নয়। আর এর অর্থ হলো, হে রসূল! আমরা নিজেদের যে ওহী তোমার ওপর উম্মতের হেদায়েতের জন্য নাযেল করব তা তুমি বিস্মৃত হবে না। আর আমরা কিয়ামত পর্যন্ত সেটির সুরক্ষা করব। এই প্রতিশ্রুতি সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়াদি আর জাগতিক কাজকর্ম অথবা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক রীতিনীতি সম্পর্কে মোটেই নয়। অতএব হাদীস থেকেও প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) কখনো কখনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুলে যেতেন। বরং হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো কখনো নামায পড়ানোর সময় রাকাতের সংখ্যা ভুলে যান আর মানুষ তাকে স্মরণ করানোর পর তাঁর স্মরণ হয়। বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আরো অনেক ক্ষেত্রে তিনি ভুলে যেতেন।

বরং হাদীসে মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন যে, **'ইন্নামা আনা বাশারুন আনসা কামা তানসাওনা ফাইযা নাসীতু ফাযাক্কিরুনী'**। অর্থাৎ আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আর যেভাবে কখনো কখনো তোমরা ভুলে যাও, অনুরূপভাবে আমিও ভুলতে পারি। অতএব আমি যদি কোন বিষয় ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 11 April, 2019 Issue No.15

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সুতরাং যেভাবে মহানবী (সা.) এর কখনো কখনো সাধারণ ও সাময়িক বিস্মৃতি হতো, অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কিছু সময়ের জন্য তিনি বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুতরাং এটিই সেই ব্যাখ্যা যা জাদু সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সম্পর্কে অতীতের কতিপয় আলেমগণও করেছেন। যেমন আল্লামা মাআযারী বলেন,

মহানবী (সা.) এর সত্যতার পক্ষে অগণিত অকাট্য দলীল রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাদিও তাঁর সত্যতার সাক্ষী। তা ছাড়া সাধারণ জাগতিক বিষয়াদি, যার জন্য তিনি প্রেরিত হন নি, সে ক্ষেত্রে এটি কোন রোগের অসুস্থতা ধরে নিতে হবে যেভাবে কোন মানুষ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়।

আর আল্লামা ইবনুল কাসার বলেন যে, মহানবী (সা.) এর এই যে সাময়িক বিস্মৃতির রোগ হয়েছিল তা রোগ সমূহের মাঝে একটি রোগ ছিল যেমনটি হাদীসের শেষ শব্দাবলী থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। (হাদীসে এটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে।)

সারকথা হলো- হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.) এর উপরোল্লিখিত অবস্থা, যেটিকে শত্রুরা জাদু করার ফলাফল আখ্যা দিয়েছে, তা মোটেই কোন জাদু-টোনা ইত্যাদির ফলাফল ছিল না। বরং উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী কেবলমাত্র বিস্মৃতির একটি রোগ ছিল, যেটিকে কতিপয় নৈরাজ্যবাদী মহানবী (সা.) এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। পবিত্র কুরআন নবীদের ওপর জাদু করার গল্পকে সম্পূর্ণভাবে রহিত করে। মানুষের বিবেকও তা গ্রহণ করে না। হাদীসের শব্দ এই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে যা এর প্রতি আরোপ করা হচ্ছে। আর স্বয়ং সৃষ্টির সেরা ও সবশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.) এর উন্নত মর্যাদা জাদু সংক্রান্ত এই ঘটনার মূলোৎপাটন করছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এখানে এই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, আর এ কথাও বৃথা হবে না, যেমনটি কিনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) এর রেওয়ায়েত রয়েছে, (তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখনকার কথা বলা হচ্ছে) আর সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী সীরাতুল মাহদী-র প্রথম খণ্ডের ৭৫ নম্বর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার গুজরাত -এ বসবাসকারী এক উগ্রপন্থী হিন্দু কাদিয়ান এসেছিল আর সে সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাঁর (আ.) ওপর নীরবে মনোযোগ নিবদ্ধ করে যেন তাঁর মাধ্যমে কোন অশোভন আচরণ করিয়ে তাকে মানুষের উপহাসের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করতে পারে। কিন্তু যখন সে তাঁর (আ.) প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন সে চিৎকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমার কী হয়েছিল? তখন সে উত্তর দেয় যে, আমি যখন মির্যা সাহেবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি তখন আমি দেখতে পাই যে, আমার সম্মুখে এক হিংস্র বাঘ দাঁড়িয়ে আছে যে আমার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত, আর আমি সেটির ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাই। তিনি লিখেন যে, যখন খাদেম, (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো মহানবী (সা.) এর সেবক মাত্র) যখন সেবকেরই এরূপ মর্যাদা রয়েছে যে, তাঁর ওপর আল্লাহ্ তা'লা সম্মোহন বিদ্যার প্রভাব পড়তে দেন নি, সেখানে প্রভুর সম্পর্কে এই ধারণা করা, অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ কথা মনে করা যে, তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ এক ইহুদীর সম্মোহন বিদ্যার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন, এটি কীভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে?

(মাযামীনে বশীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪২-৬৫৩, ১৯৫৯ ইং)

পরিশেষে যুগের হাকাম এবং আদাল এর এ সম্পর্কিত উদ্বৃতি পাঠ করছি যা সকল ব্যাখ্যা এবং বর্ণনাকে ঘিরে আছে।

এক ব্যক্তি তাঁর (আ.) বৈঠকে প্রশ্ন করে যে, মহানবী (সা.) এর ওপর কাফেররা যে জাদু করেছিল সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাদুও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। রসূল এবং নবীদের মর্যাদা এমন নয় যে, তাদের ওপর জাদুর কোন প্রভাব পড়তে পারে। বরং তাদেরকে দেখে জাদু পলায়ন করে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (সূরা তাহা: ৭০)। অর্থাৎ দেখ! হযরত মূসা (আ.) এর বিপরীতেও জাদু ছিল, অবশেষে মূসা (আ.) বিজয়ী হয়েছেন কিনা? এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে, মহানবী (সা.) এর বিপরীতে জাদু প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা কখনো এটি গ্রহণ করতে পারি না। চোখ বন্ধ করে বুখারী এবং মুসলিমকে গ্রহণ করে নেওয়া আমাদের রীতি পরিপন্থী। এটি তো মানুষের বিবেকও গ্রহণ করবে না যে, এমন উন্নত পর্যায়ের নবীর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছে। এই জাদুর প্রভাবে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) এর স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছিল, আর এটি হয়েছিল, সেটি হয়েছিল- এসব কথা কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না।"

তিনি আরো বলেন, মনে হয় কোন কুচক্রী ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে এসব কথা রটিয়েছে। যদিও আমরা হাদীসকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে হাদীস পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ও মহানবী (সা.) এর পবিত্রতার বিরোধী হয়, সেটিকে আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি! তখন হাদীস সংগ্রহের সময় ছিল। যদিও তারা, অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহকারীরা, অনেক ভেবেচিন্তে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু অনেক সতর্কতা অবলম্বনের পরও পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন নি। (তখন হাদীস একত্রিত করার সময় ছিল, কিন্তু এখন গভীর প্রণিধান এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করার সময়) গভীর দৃষ্টি দাও আর প্রণিধান কর। কোন হাদীস যদি পবিত্র কুরআন অথবা মহানবী (সা.) এর পবিত্রতার বিরোধী হয় তাহলে তা বাতিলযোগ্য। অথবা তার ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা রয়েছে যেমনটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব করেছেন বা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) করেছেন। পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীদের জীবনের ঘটনাবলী এবং তাদের কথা একত্রিত করা অনেক পুণ্যের কাজ। কিন্তু এটিও একটি নীতিগত কথা যে, সংগ্রহকারীরা গভীরভাবে প্রণিধান করতে পারে না। এখন প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে যে, সে যেন গভীরভাবে প্রণিধান করে আর যেগুলো গ্রহণীয় সেগুলোকে গ্রহণ করে আর যেগুলো পরিত্যাজ্যসেগুলোকে পরিত্যাগ করে। এমন কথা বলা যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) এর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছিল, এতে তো ঈমান হারিয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (সূরা বনি ইসরাঈল: ৪৮)। অর্থাৎ যখন যালেমরা বলে যে, তোমরা কেবল এমন এক ব্যক্তির অনুবর্তীতা করছ যে জাদুগ্রস্ত, যার ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছে বা যে জাদুর প্রভাবাধীন হয়েছে, এমন কথা যারা বলে তারা মুসলমান নয় বরং যালেম। এটি তো বেঈমান এবং যালেমদের কথা যে, মহানবী (সা.) এর ওপর নাঊযুবিল্লাহ্ জাদু-টোনার প্রভাব পড়েছে। তারা এতটুকুও চিন্তা করে না যে, নাঊযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.) এর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তাঁর উম্মতের কী অবস্থা হবে? তারা তো তাহলে পুরোপুরি নিমজ্জিত হবে। জানি না এদের কী হয়েছে, যে নিষ্পাপ নবী (সা.) কে সকল নবীগণ শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র মনে করে আসছে, তারা তাঁর (সা.) নামে এমনসব কথা বলে! (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৭১-৪৭২)

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা যুগ ইমামকে মানার কারণে মহানবী (সা.) এর মাকাম এবং মর্যাদাকে জানি এবং অনুধাবন করি।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।

****

আল্লাহ্‌র বাণী

"এবং আকাশে তোমাদের রিযক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। (আয যারিয়া, আয়াত: ২৩)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্‌র বাণী

বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।

(আয যারিয়া, আয়াত: ২০)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir